অপসংস্কৃতি ও সংস্কৃতি : অবক্ষয় ও উজ্জীবন

আবুল কাসেম ফজলুল হক*

'অপসংস্কৃতি' কথাটি প্রথম কে, কোথায় কখন, কেন, কি অর্থে ব্যবহার করেছিলেন আমরা জানি না, তবে ঢাকায় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় এই শব্দটি আমরা প্রথম দেখি ১৯৭০-এর দশকে—একই সময়ে শব্দটিকে আমরা ঘণ ঘণ উচ্চারিত হতেও শুনি সভায়-সমাবেশে ও রেডিও-টেলিভিশনে। কলকাতায় শব্দটি এর অনতিপূর্বে চালু হয়েছিল বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হওয়ার (১৯৭৭) অনতিপরেই, ফ্রন্টের সমর্থক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ নারায়ণ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি' (১৩৮৪/১৯৭৭) নামে ষোলজন বিশিষ্ট লেখকের রচনা সংবলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সম্পাদক লিখিত ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে "অপসংস্কৃতি...কথাটার ব্যাকরণগত ঔচিত্য যাই হোক, এটা একটা প্রচলিত, মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য শব্দ। ব্যাপক ব্যবহারে বৈয়াকরণিক দোষ অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে।"[১] ভাষাগত দিক দিয়ে 'অপসংস্কৃতি' শব্দটির শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে এ গ্রন্থের আরও দু একজন লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, তবে শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখে তাঁরাও এটিকে বাংলা ভাষার একটি অর্থসমৃদ্ধ শব্দ রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় নারায়ণ চৌধুরী আরও লিখেছেন "পশ্চিম বাংলার নতুন বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অত্যল্প কাল মধ্যেই অপসংস্কৃতির বিরোধ আর সুস্থসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের কাছে

---

* বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সনির্বন্ধ আবেদন রেখেছেন। আমরা তাঁর এই আবেদন অত্যন্ত সময়োচিত বলে মনে করি এবং আমাদের আশা আছে প্রগতিশীল ভাবনা ধারণার আদর্শে বিশ্বাসী বামফ্রন্ট সরকার এবং তাদের পশ্চাদ্‌বর্তী এ রাজ্যের অগণিত জনমানুষের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিদেহ থেকে অচিরেই অবক্ষয় ও বিকারের বিষাক্ত জড় নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হবে। চারদিকে তার শুভ সূচনা দেখছি।"[২] এ গ্রন্থে প্রকাশকের নিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আজ অবক্ষয়ের লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট। সেই অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক 'অপসংস্কৃতি' এই সাধারণ কথাটির মধ্য দিয়ে পরিব্যক্ত। অপসংস্কৃতির সমস্যা আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, এবং অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ তথা সুস্থসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা সমাজের মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রেরই ঐকান্তিক আকাঙ্খার বস্তু হয়ে উঠেছে। আমরা এই সঙ্কলন গ্রন্থে আদর্শ সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির বিকাশ এই দুই দিক সম্বন্ধেই যতদূর সম্ভব একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সূত্রপাত করলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু ও বক্তব্য নিয়ে চারদিকে বিচার বিতর্ক চিন্তামন্থন চলুক—এই আমাদের অভিপ্রায়।"[৩] এই সব উক্তি এবং পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা সূত্রে জানা যায় যে, বাম-ফ্রন্টের অঙ্গদল সমূহের অনুসারী ও সমর্থক লেখক-পাঠকদের মধ্যে অপসংস্কৃতির ধারণাটি বিকশিত হতে আরম্ভ করেছিল ফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই। উল্লেখ করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, বামফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল ক্ষমতা দখলের অনতিপূর্বে, ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে, নির্বাচনের (১৯৭৭) সময়ে। পশ্চিম বাঙলায় হয়তো অন্যান্য চিন্তাধারার অনুসারীদের মধ্যেও শব্দটির প্রচলন ঘটেছিল। তবে, আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞতার সুযোগে, ১৯৭০-এর দশক শুরু হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত কলকাতার পুস্তকাদিতে বা পত্র-পত্রিকায় শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি।

হয়তো, বাঙলাদেশে অপসংস্কৃতির ধারণার সূত্রপাত হয়েছিল পশ্চিম বাঙলার লেখকদের প্রভাবেই। তবে পশ্চিম বাঙলায় ধারণাটিকে নিয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারী শক্তিসমূহ, আর বাঙলাদেশে সরকার বিরোধী শক্তিসমূহ—কোন নির্দিষ্ট সরকার নয়, ১৯৭৩-৭৪ সন থেকে একটির পর একটি সরকার। অবশ্য, দলীয় রাজনীতির বাইরে দাঁড়িয়েও

অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করছেন—পশ্চিম বাঙলায় এবং বাঙলাদেশে। বাঙলাদেশে অতি সম্প্রতি নবীন লেখকদের রচনায় 'কুসংস্কৃতি' ও 'সুসংস্কৃতি' এই দুটি শব্দও ব্যবহৃত হতে দেখছি।

'সংস্কৃতি' কথাটিকে culture অর্থে বাঙলা ভাষায় চালু করেন রবীন্দ্রনাথ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায়, ১৯২০-এর দশকে। শব্দটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ধীরে ধীরে, রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ গ্রহণের, এবং অন্তত দেড় দশক কালের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে। তার আগে culture অর্থে কিছু কালের জন্য 'কৃষ্টি' শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু হয়েছিল। এ সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

> 'সংস্কৃতি' শব্দটি culture বা civilization অর্থে আমি প্রথমে পাই ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে culture-এর বেশ ভালো প্রতিশব্দ বলে শব্দটি আমার মনে লাগে। আমার বন্ধু শব্দটি পেয়ে আমার আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন— তিনি বললেন যে তাঁরা তো বহুকাল ধরে মারাঠী ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার করে আসছেন।
>
> ১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।··· আমার বেশ মনে আছে, culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, কৃষ্টি শব্দ আর ব্যবহার করা ঠিক হয় না, এ কথাও বলেন।[৪]

বাঙলা ভাষায় culture-অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটি চালু করেছিলেন সম্ভবত যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। 'কৃষ্টি' শব্দটির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে রবীন্দ্রনাথের লিখিত এক বক্তব্যের প্রতিবাদ করে যোগেশ চন্দ্র লিখেছিলেন, "বোধহয় প্রথমে আমি কৃষ্টি শব্দ প্রয়োগ করি। সে দশ বারো বৎসর পূর্বের কথা। আমি এখনও কৃষ্টি লিখে থাকি। সংস্কৃতি দেখেছি, কিন্তু আমার মনে লাগেনি। সংস্কৃতি ও সংস্কার অর্থে এক।"[৫] নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, ঃ "ইংরেজি culture-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে কৃষ্টি শব্দটি কখনও কখনও··· বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছিল ; ১৯২৪-২৫ কি তার দু-এক বৎসর

আগে বা পরে যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মশায় বোধ হয় প্রথম এর প্রচলন করে থাকবেন। হিন্দী ভাষায় শব্দটির ব্যবহার একেবারে অজানা ছিলনা; অনুমান হয় যোগেশচন্দ্র হিন্দী থেকেই শব্দটি আহরণ করে থাকবেন।"[৬]

বাংলা ভাষায় culture অর্থে কৃষ্টি শব্দটির ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "....মোটামুটি ১৯৩২-৩৩ থেকে ১৯৩৭-৩৮ পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ একটি শব্দ নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন; শব্দটি 'কৃষ্টি'।" "....কৃষ্টি শব্দটি যে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করতে পারেনি, শুধু তাই নয়, এই শব্দটির প্রচলন আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলেন এবং বাংলা ভাষায় যাতে এর অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি।"[৭] রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়কার কিছু লেখা থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংকলিত করে নীহাররঞ্জন মন্তব্য করেছেন: "বাংলা ভাষায় কোনও একটি শব্দের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এ-ধরনের জেহাদ ঘোষণা রবীন্দ্রনাথ জীবনে আর কখনও করেছেন বলে আমার জানা নেই। এমন যুক্তির উপর যুক্তি সাজানো, এমন নির্মম পরিহাস বাংলায় আর কোনও শব্দের ভাগ্যে জোটেনি। ...তিনি পণ করেছিলেন কৃষ্টিকে ঠেকাবেনই, যেমন করেই হোক। সে পণ তাঁর সার্থক হয়েছে। বাংলা ভাষায় কৃষ্টি চালু হতে পারেনি, চালু হয়েছে সংস্কৃতি; বলা বাহুল্য তাঁরই একক চেষ্টায়।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ culture-অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটির ব্যবহারের বিরুদ্ধে এতটা সক্রিয় হয়েছিলেন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কারণে। তিনি জেনেছিলেন যে 'কৃষ্টি' শব্দের সম্পর্ক আছে 'কৃষি' 'কর্ষণ' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে। তাই 'কৃষ্টি'-কে তাঁর কাছে চাষ-বাস ও চাষা-ভূষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় বলে মনে হত। এই শব্দের মধ্যে কোনো উচ্চ ভাবের কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। 'মানুষের ধর্ম' (১৩৪০) গ্রন্থ সহ রবীন্দ্রনাথের সাতটি রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নীহার-রঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পরিচয়' সম্পাদক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ; তবু আন্দাজে

> বলতে পারি, বন্ধুরা আমাকে কালচার্ড বলেই গণ্য করেন। কিন্তু যদি তাঁরা আমাকে সহসা কৃষ্টিমান উপাধি দেন বা আমার কৃষ্টিমত্তা সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন কথার উত্থাপন করেন, তবে বন্ধুবিচ্ছেদ হবে। অন্তত আমার মধ্যে কৃষ্টি আছে এ কথার প্রতিবাদ করাকে আমি আত্মলাঘব মনে করব না।
>
> ইংরেজী ভাষায় চাষ এবং ভব্যতা একই শব্দে চলে গেছে বলে কি আমরাও বাংলা ভাষায় ফিরিঙ্গিয়ানা করব? ইংরেজিতে সুশিক্ষিত মানুষকে বলে কাল্টিভেটেড্—আমরা কি সেই রকম উঁচুদরের মানুষকে চাষ করা মানুষ বলে সম্মান জানাব, অথবা বলব কেদারনাথ?
>
> সংস্কৃত ভাষায় উৎকর্ষ প্রকর্ষ শব্দের ধাতুগত অর্থে চাষের ভাব আছে, কিন্তু ব্যবহারে সে অর্থে কেটে গেছে। কৃষ্টিতে তা কাটেনি। সেইজন্যে তোমাদের সম্পাদকবর্গের কাছে আমার এই প্রশ্ন, চিৎপ্রকর্ষ, চিত্তপ্রকর্ষ বা চিত্তোৎকর্ষ শব্দটাকে কাল্চার অর্থে চালালে দোষ কি? কালচারড্ মানুষকে প্রকৃষ্টচিত্ত লোক বলা যেতে পারে। কাল্চারড্ ফ্যামিলিকে প্রকর্ষবান পরিবার বললে সে পরিবার গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কৃষ্টিমান বললে চন্দনের সাবান মেখে স্নান করতে ইচ্ছে হবে।[৯]

'কৃষ্টি' শব্দের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উগ্র ও চরম মনোভাব সত্ত্বেও এবং বাঙলা ভাষায় culture-অর্থে সংস্কৃতি শব্দের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি' পুস্তকে নীহাররঞ্জন রায় যুক্তি দেখিয়েছেন যে এ ক্ষেত্রে 'কৃষ্টি' শব্দটি 'সংস্কৃতি' শব্দটির চেয়ে অধিক যুক্তিসিদ্ধ। তা ছাড়া, culture এবং তার জার্মান প্রতিশব্দ Kultur, চাষ বাসের অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত নয়। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়ঃ

> ···কৃষ্টির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে একাধিক যুক্তি উপস্থিত করেছেন তার ভিৎ শিথিল, পায়ের নীচে স্থির ভূমি নেই বললেই চলে। শব্দটি ইংরেজি কালচার-এর উনিশ বা বিশ শতকীয় বাংলা অনুবাদ নয়; তার চেয়ে প্রাচীন। ···শুধু ফল ফুল শস্য উৎপাদনের জন্য ভূমি চাষের অর্থে নয়, মানুষের জীবন-বনভূমি চাষের অর্থেও। এই পরম্পরাসিদ্ধ অর্থেই অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদে

> কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন তাঁর একটি গানের পদ রচনা করে-ছিলেন, 'এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা'। ···'কৃষ্টি' শব্দটি 'সংস্কৃতি' শব্দটির চেয়ে বেশী অর্থবহ এবং সেইহেতু বেশি যুক্তিসিদ্ধ। ··· কৃষ্টির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ তাঁর নিজস্ব সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। সে তত্ত্বের অন্যতম সূত্র হচ্ছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা, যা মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনের সীমার বাইরে তার ভেতর থেকেই শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি। কৃষিকর্ম, চাষবাস একান্তই জীবনের স্থূল প্রয়োজন মেটাবার জন্য; সুতরাং সেই কর্ষণ ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত যে শব্দ কৃষ্টি তা তো শিল্প-সাহিত্য অর্থাৎ মানুষের মনজ-কল্পনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে বোঝাতে পারে না।[১০]

উক্ত গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় প্রমাণ করেছেন যে, "কৃষ্-ধাতু থেকে ক্তি-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন কৃষ্টি ও ল্যাটিন col ধাতু থেকে নিষ্পন্ন culture বা কুল্তুরা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত এক বা একাধিক অর্থ একই আর্য ভাষী জন বা জনসমূহের আবহ ও পরিবেশ থেকে উদ্ভূত। পাশ্চাত্য পৃথিবীতে কাল্চার শব্দটির ব্যবহার যেমন ভূমিচাষ অর্থে এবং মানব-চিত্তভূমির চাষ অর্থেও বটে, ঠিক তেমনি ভারতবর্ষেও সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্টি শব্দটির ব্যবহারও এই উভয় অর্থেই, এবং তা একই কারণে।" রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ করে তিনি লিখেছেন, "এর মধ্যে ইংরেজির অনুকরণপ্রিয়তার বা অনুবাদের মাধ্যমে 'পাশ্চাত্য পৃথিবীর নতুন ধ্যানধারণার আমদানী'র কোনও প্রশ্নই নেই।"[১১]

নীহাররঞ্জন রায় বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, "কাল্চার এমন ধ্যানধারণা নয় যা আমরা য়ুরোপ থেকে আমদানি করেছি। এতৎসম্পর্কিত ধারণাটি প্রাচীন; কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অনুশীলন, চর্চা চর্যা—এসব শব্দই তার প্রমাণ[১২] কালচার-এর ধারণাটি কোন-না-কোনভাবে বাংলা ভাষায় এবং সংস্কৃত ভাষায় ছিল, এবং ধর্মের ধারণার সঙ্গে মিশে ছিল, তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হবে না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আচার-প্রবন্ধ' 'পারিবারিক প্রবন্ধ' 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থে যেসব বিষয় আলোচনা করেছেন সেগুলো 'কাল্-চার'-এরই অন্তর্গত, এইসব গ্রন্থে তিনি একজন সংস্কৃতিবিদ—যদিও সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কাল্চার এসব শব্দ তাঁর আলোচনায় আসেনি।

হয়তো ইংরেজী culture-এর ধারণার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। বলা বাহুল্য, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরোপুরি রক্ষণশীল, কিন্তু জ্ঞানবান, মার্জিত, নৈতিক আবেদন সৃষ্টিকারী, ভারতীয় ঐতিহ্যের ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসারী। তাঁর ভাষায় বর্ণনা রীতিতে, যুক্তি প্রয়োগে নতুনত্ব আছে, চিন্তাধারায় ইংরেজী-শিক্ষার ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের পরিচয়ও আছে, কিন্তু তার প্রথম এবং শেষ পরিচয়—তিনি রক্ষণশীল, পুরোপুরি রক্ষণশীল, প্রায় সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণবাদী, নতুন যে-কোন কিছুকে গ্রহণ করতে পরাংমুখ। কাল্‌চার এর ধারণাটি ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে মিশে, আমাদের ঐতিহ্যে—বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় থেকে থাকলেও বাংলা ভাষায় 'অনুশীলন' 'কৃষ্টি' 'সংস্কৃতি'—প্রধানত এই তিনটি শব্দকে অবলম্বন করে নতুন অর্থে, নতুন দ্যোতনায়, নতুন তাৎপর্যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে বাঙালির পরিচয়ের ফলে। এভাবে বাঙলা ভাষায় ধারণাটির সূত্রপাত, আমার মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের ,অনুশীলনতত্ত্ব' থেকে—'অনুশীলন' শব্দটিকে অবলম্বন করে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের মূল বিষয় শব্দ বা শব্দতত্ত্ব নয়, ভাষা বা ভাষাতত্ত্বও নয়। প্রসঙ্গক্রমেই শব্দ ব্যবহারের কথা এসেছে। আমাদের অনুসন্ধানের মূল বিষয়—বাঙলাভাষায় সংস্কৃতির ধারনাটির ক্রমবিকাশ। তবে সে আলোচনায় প্রবেশের আগে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রচলন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

কৃষ্টির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন সত্ত্বেও, এবং সংস্কৃতির চেয়ে কৃষ্টিকেই অধিকতর উপযোগী প্রমাণ করলেও, নীহাররঞ্জন রায় 'সংকৃতি' শব্দটিকেই কালচার-অর্থে গ্রহণ করে নিয়েছেন, শব্দটি প্রচলিত হয়ে যাওয়ার কারণে। অনুসন্ধান করা যাক শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ঘটল কখন কিভাবে? সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৪০-এর দশকে লিখেছেন ঃ

> সংস্কৃতি শব্দটি আজকাল বাঙলায় খুবই চলছে। চারদিকেই বিশেষতঃ তরুণদের মধ্যে, নানা সংস্কৃতি সভার আর সস্কৃতি—সম্মেলনের কথা শোনা যাচ্ছে। এই সভা আর সম্মেলন

করা আজকাল শিক্ষিত আর শিক্ষিতুকাম জনসমূহের মধ্যে একটি বাতিক বা ব্যসনের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'সংস্কৃতি বললে কী বোঝা উচিত, সে সম্বন্ধে হয়তো সকলের একটা স্পষ্ট ধারণা নেই; কিন্তু একটা আবছা-আবছা বোধ বা অনুমান সকলেরই আছে যে, 'সংস্কৃতি' দ্বারা সাহিত্য সংগীত রূপ-কলা নৃত্য এইসব ধরতে হয়। বাঙলাদেশে বা বাঙালীদের মধ্যে এবং বাঙলার বাইরে বহু অবাঙালীর মধ্যেও—একটা এই ধরনের বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন আর বিশ্বভারতীতেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি তার সবচেয়ে লক্ষণীয় রূপ নিয়েছে। সংস্কৃতি শব্দটি আর তার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি কিন্তু প'চিশ ত্রিশ বছর আগে এতটা লোকপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।[৩১] উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। কিছু ঐতিহাসিক তথ্য এতে ফুটে উঠেছে। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ

ভারতীয় পরম্পরায় কবি সম্মেলন, সাহিত্য-সমাবেশ, প্রকাশ্য পাঠ ও আবৃত্তি, পণ্ডিত সম্মেলন, নৃত্যগীতের আসর, অভিনয়ের আসর, কবির লড়াই, বিদ্বজ্জন সম্মেলন, ও তর্কযুদ্ধ ইত্যাদি কিছু অজানা ছিল না। পাড়া-গাঁ থেকে শুরু করে গঞ্জে-বাজারে শহরে-নগরে এসব আসর-সম্মেলন প্রায়শই হতো। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানকে কেউ কখনও cultural function বা cultural conference, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি-সম্মেলন বা অনুষ্ঠান বলতো না। যতদুর মনে পড়ে ১৯৩০-৩১-এর আগে তার কোনও প্রমাণ আমার জানা নেই, বস্তুত কলকাতায় ও তদানীন্তন বাংলাদেশে cultural conference বা সংস্কৃতি সম্মেলন বস্তুটির দ্রুত প্রচলন হয় ১৯৩৫-এর পর থেকে, প্রধানত রাজনৈতিক গণআন্দোলনে বা তার অনুষঙ্গরূপে। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে এবং পঞ্চাশের দশকের সবটা জুড়ে, প্রধানত দলের পরিধি বিস্তারোদ্দেশ্যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই মাঝে মাঝে এক-একটি সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করতেন; আমার ধারণা, তাঁরা এই অভ্যাসটি শিখেছিলেন সোস্যালিস্ট ও

> কম্যুনিস্ট য়ুরোপের রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যাস ও আচরণ থেকে। যাই হোক, রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টান্ত দেখে কিছু কিছু অরাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ও এ-ধরনের cultural conference বা সংস্কৃতি-সম্মেলন অনুষ্ঠানে ব্রতী হন। এ-ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠান আজ সর্বভারতেই প্রচলিত এবং তা cultural conference, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি-সম্মেলন বলেই খ্যাতি লাভ করে গেছে।

নীহাররঞ্জন রায়ের এই উক্তি ১৯৭৯ সনের। এই উক্তিতেও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতি কথাটির ব্যাপক প্রচলন যে এদেশে কমিউনিস্টদের, মার্কসবাদ-সমর্থকদের, বিপ্লবোত্তর কালের মস্কো-সমর্থকদের দ্বারা হয়েছে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে—সুতরাং এ তথ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। গোপাল হালদার প্রণীত 'সংস্কৃতির রূপান্তর' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সনে। এ-বইয়ের ১৯৬৪ সনে প্রকাশিত সপ্তম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন ঃ "সংস্কৃতির রূপান্তর প্রথমাবধি পাঠকের নিকট যে সমাদর লাভ করিয়াছে, এ দেশে অতি অল্প বাঙলা গ্রন্থের ভাগ্যেই তাহা ঘটে।" বলা বাহুল্য "সংস্কৃতির রূপান্তর' পঠিত হয়েছে প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের দ্বারাই। তবে কমিউনিষ্টদের দ্বারা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের দ্বারা শব্দটির অর্থ অনেক পরিবর্তিত হয়। তবে পরিবর্তিত অর্থ রাজনৈতিক মহলেই সীমাবদ্ধ থাকে।

Culture-অর্থে সংস্কৃতি শব্দটি উদ্ভাবিত হওয়ার অনেক পূর্ব থেকেই বাংলাভাষায় culture এর ধারণাটি বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে। অনেকেই অনুশীলন, সভ্যতা, কৃষ্টি, চর্চা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তা-ছাড়া আরও নানা শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—সেগুলোর কয়েকটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। culture-অর্থে প্রমথ চৌধুরী ব্যবহার করেছে 'বৈদগ্ধ' বেগম রোকেয়ার রচনাবলীতে দেখা যায় 'শিক্ষা'। 'শিক্ষা' বলতে তিনি পরীক্ষা পাশের বা ডিগ্রী লাভের প্রস্তুতি বোঝাননি, সংস্কৃতির ধারণাটিকেই ধরার চেষ্টা করেছেন।

বাঙলা ভাষায় culture-এর ধারণাটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রথম

প্রয়োগের সাক্ষাৎ আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' বইতে। 'ধর্মতত্ত্ব। প্রথমভাগ। অনুশীলন' এই নামে এ-বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সনে। এ-বই রচনার আগেই তিনি জেরেমি বেন্থাম, স্টয়ার্ট মিল এবং অগাস্ট কোঁৎ প্রমুখের রচনাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। মেথ্যু আর্নল্ড এর রচনাবলীও পড়েছিলেন, তাঁর Culture and Anerchy গ্রন্থের উল্লেখ 'অনুশীলনতত্ত্বে' আছে। হিন্দু-শাস্ত্রে, ভারতীয় দর্শনে ও সংস্কৃত সাহিত্যেও ছিল তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান।

'অনুশীলনতত্ত্বে' 'অনুশীলন' শব্দটি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছিলেন culture শব্দের অনুসরণে, অনুকরণ বা অনুবাদ করে নয়। তাঁর আগে কোন বাঙালী ইউরোপীয় ধারণা অনুযায়ী culture বিষয়টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—এমন তথ্য পাওয়া যায় নি। গত শতাব্দীর শেষ দুই দশক ব্যাপী অনুশীলন হয়তো culture এর প্রতিশব্দ হিসেবেই আমাদের ভাষায় প্রচলিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনের ধারণাটিকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন ভারতীয় ও ইউরোপীয়, প্রজ্ঞার সংশ্লেষণের ভিত্তিতে বাস্তব-সম্মত, ব্যবহারোপযোগী, কার্যকর, সর্বাঙ্গীন জীবন দর্শন হিসেবে। তৎকালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতবর্ষের মানুষ ধর্ম সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনে ভালো হওয়ার জন্য যে চেষ্টা করে, ইউরোপের মানুষ culture-এর সাধনা দ্বারা মোটামুটি তাই করে। কোন কোন দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে পার্থক্যও তিনি লক্ষ্য করেছেন। ধর্মের ধারণার সঙ্গে culture-এর ধারণার সংশ্লেষণ ঘটবার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি ভালো জীবন যাপনের একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন ও প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

গুরু শিষ্যের সংলাপের পদ্ধতিতে রচিত 'অনুশীলন তত্ত্বে' তার এই প্রয়াসের পরিচয় আছে। শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে গুরুর সংলাপে লিখেছেন ঃ

> অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—'এ জীবন লইয়া কি করিব ?' 'লইয়া কি করিতে হয় ?' সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি,

অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সংঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে আমি এ তত্ত্ব [অর্থাৎ অনুশীলনতত্ত্ব—আজ আমরা যাকে বলি সংস্কৃতি] কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এতদিনে পাইয়াছি। তুমি একদিনে ইহার কি বুঝিবে ?

'অনুশীলনতত্ত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফসল। এ তত্ত্বকে আরও বিকশিত করার আকাঙ্খা তাঁর ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আকাঙ্খাকে ফসল হতে দেয় নি, বইটির দ্বিতীয় ভাগ রচিত হতে পারেনি। বঙ্কিমের চিন্তাধারার প্রভাবে এক সময় 'ধর্মজিজ্ঞাসা' 'নীতি জিজ্ঞাসা' 'অনুশীলন-তত্ত্ব' 'মনুষ্যত্ব তত্ত্ব' 'অনুশীলন ধর্ম', 'মনুষ্যত্ব ধর্ম' ইত্যাদি কথা বাঙলার শিক্ষিত সমাজে চালু হয়েছিল। স্বদেশী ভাবধারাকে তিনি সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন উন্নততর বিদেশী ভাবধারার দ্বারা। প্রাণান্ত পরিশ্রমের সাহায্যে বঙ্কিম চেয়েছিলেন culture-এর ধারণাটিকে বুঝতে, এবং তাঁর দেশবাসীকে বোঝাতে। বঙ্কিমের মতে, 'জীবন যাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় কি?' — এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান, আজ আমরা যাকে সংস্কৃতি বলি, তার অপরিহার্য অঙ্গ। অনুশীলনতত্ত্বের সারমর্ম বঙ্কিমের নিজের ভাষায় এরূপ ঃ

১. মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি instinct, impulse, faculty নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।
২. তাহাই [অর্থাৎ মনুষ্যত্বই] মানুষের ধর্ম।
৩. সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।
৪. তাহাই সুখ।

এখানে বৃত্তি বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়েছেন মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদিকে। তাঁর মতে মানুষের কর্তব্য হল—বৃত্তি সমূহকে দমন করা নয়, আত্মপীড়ন নয়, বৃত্তি সমূহের অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা।

অর্থাৎ সুখী হওয়া। এই কর্তব্য পালনের চেষ্টার মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব নিহিত। এখানে এই মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম বলা হয়েছে, এবং মনুষ্যত্ব সাধনাই অভিহিত হয়েছে মানুষের ধর্ম সাধনা বলে। বঙ্কিমের মতে, মানুষের জীবনে বৃত্তিসমূহের অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা যে স্বেচ্ছাচারতা, অবিমৃষ্যকারিতা, অপরিনামদর্শিতা ও নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে সম্ভব নয়। মনুষ্যত্বসাধনা হল বৃত্তিসমূহের সুষম বিকাশের ও চরিতার্থতার সজ্ঞান, সতর্ক, সশ্রম, দূরদর্শী অনুশীলন। এরূপ অনুশীলনের মাধ্যমে বৃত্তিসমূহের চরিতার্থতাই অভিহিত হয়েছে 'সুখ' বলে। বঙ্কিমের মতে এই 'সুখ' অর্জনের চেষ্টা আর মনুষ্যত্ব সাধনা অভিন্নার্থক। স্টুয়ার্ট মিলের utilitarianism গ্রন্থেরও এটাই মর্ম কথা।

বৃত্তি সমূহের যদৃচ্ছ পরিতৃপ্তি দ্বারা সাময়িক সুখ ভোগ করা যেতে পারে; কিন্তু সাময়িক সুখ প্রায়শ পরিণতিতে দুঃখ বয়ে আনে। এ জন্যই বৃত্তি সমূহের পারস্পরিক সামঞ্জস্য, পরিমিতি, চরিতার্থতার সীমা ইত্যাদি বিষয়ের কথা বঙ্কিম বার বার গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। মানুষকে তিনি অভ্যাসের দাস রূপে দেখেন নি, দেখেছেন তার সৃষ্টি ক্ষমতার ও উন্নতির প্রয়াসের মধ্যে।

মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রবণতা ও টানা পোড়েন একই সঙ্গে তার দেহের ও তার পরিবেশের অন্তর্গত। দেহ-নিরপেক্ষ/পরিবেশ-নিরপেক্ষ নিরবলম্ব কোন বৃত্তি, কামনা, আশা, ক্ষুধা, পছন্দ, অনুরাগ-বিরাগ টানাপোড়েন নেই। প্রবৃত্তি, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অনুরাগ বিরাগের প্রকাশ ঘটে দেহের ওপর দেহ বহির্ভূত নানা জিনিষের প্রভাবে। এ জন্য বৃত্তি প্রবৃত্তির আলোচনায় অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের, স্নায়ুমণ্ডলীর ও পরিবেশের—উভয়ের প্রসঙ্গ এসে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে মানুষের সামাজিক সত্তা, সামাজিক কর্তব্য ও সমাজগঠন সম্পর্কেও বক্তব্য আছে। বৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্যের ও সুষম বিকাশের প্রশ্ন সমাজকে বাদ দিয়ে বেশিক্ষণ আলোচিত হতে পারে না। অনুশীলনতত্ত্বে বিবৃত অনুশীলনও সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বেশিদূর চালানো যায় না। এ তত্ত্বে ব্যক্তি-মানুষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ রূপে গণ্য করা হয়নি, সমাজের ও

ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিচার করা হয়েছে। বঙ্কিমের মতে মনুষ্যত্ব জন্মগতভাবে লব্ধ বা সহজাত নয়, অর্জন সাপেক্ষ। অনুশীলনতত্ত্বে গুরুর সংলাপে তিনি লিখেছেন,

> যে শিশু দেখিতেছে ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে ইহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্বগুণযুক্ত সর্বসুখ সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি। যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবেনা এমন কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতিপ্রাপ্ত হইবে তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে।

মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, আশা-আখাঙ্ক্ষা ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার সম্যক স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যকে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তশুদ্ধি বলেও অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই তাহার কোন ধর্ম নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে তাহার আর কোন ধর্মেরই প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মের সার এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দুধর্মের সার, খ্রিস্টধর্মের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলাম ধর্মের সার, নিরীশ্বর, কোমৎ-ধর্মেরও সার। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রিস্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিস্ট। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই ধার্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। ... চিত্তশুদ্ধি মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে মানবজীবনে, সমাজে, ও জাতির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে এই চিত্তশুদ্ধি অর্জনের এক অনন্ত প্রবণতা। মানবজাতি যতই পূর্ণতার দিকে এগুবে, সমাজব্যবস্থা যতই উন্নত হবে, চিত্তশুদ্ধির প্রয়াসেও ততই অধিক থেকে অধিকতর পূর্ণতা লাভের সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখা দেবে। প্রতিদিনের কথাবার্তায় আমরা—'নিজের বিবেকের কাছে নিজে পরিষ্কার থাকা' বলে যা বুঝিয়ে থাকি তার সঙ্গে

বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিত্তশুদ্ধির ধারণার কোন সম্পর্ক আছে কি ?

বঙ্কিমচন্দ্র যে-অনুশীলনের কথা বলেছেন, তা নিতান্তই চিন্তার, কল্পনার বা ধ্যানের জগতের ব্যাপার নয়, তার অভিব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বস্তুগত, ভাবগত সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ড। বঙ্কিম উপলব্ধি করেছেন যে, অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃষ্টিশক্তি ও সুখের সম্ভাবনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে—জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে বৃদ্ধি পাবে—মানুষের জীবন ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে সর্বমাত্রিক প্রস্ফুটনের দিকে যাবে। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে অনুশীলনের অর্থ আচার পালন নয়, সংস্কারে আবদ্ধ থাকা নয়, বদ্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত থাকা নয়, অভ্যাসের দাসত্ব করা নয়—ক্রমবর্ধমান সুখ অর্জনের ও সর্বমাত্রিক প্রস্ফুটনের প্রয়াস, সফল জীবনযাপন।

মহান চিন্তাবিদদের চিরায়ত ভাবধারার সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে এ দেশে একালে সংস্কৃতি সম্পর্কে যারা চিন্তা করেছেন, তাদের মধ্যে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতামত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ[১৪]

> ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।
>
> ধর্ম মানে জীবনের নিয়ন্ত্রণ। মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে। বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্ম চেতনাই তাদের চালক, তাই তাদের জন্য ধর্মের ততটা দরকার হয় না। বরং তাদের উপর ধর্ম তথা বাইরের নীতি চাপাতে গেলে ক্ষতি হয়। কেননা তাতে তাদের সূক্ষ্ম চেতনাটি নষ্ট হয়ে যায়, আর সূক্ষ্মচেতনার অপর নাম আত্মা।

তাঁর বিচার অনুযায়ী 'ধর্মের মতো মতবাদও মনের জগতে লেফট রাইট করতে শেখায়।' ধার্মিকের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা মতবাদী-

দের মধ্যেও সুলভ। ধার্মিক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> ধার্মিকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে শাস্তির ভয় আর পুরস্কারের লোভ। সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনে ওসবের বালাই নেই। তারা সবকিছুই করে ভালোবাসার তাগিদে। সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা—বিনা লাভের আশায় ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা-এরি নাম সংস্কৃতি। তাই ধার্মিকের পুরস্কারটি যেখানে বহু দূরে থাকে, সংস্কৃতিবান মানুষ সেখানে তার পুরস্কারটি পায় হাতে হাতে, কেননা কাজটি তার ভালোবাসার অভিব্যক্তি বলে তার আনন্দ, আর আনন্দই তার পুরস্কার। সে তার নিজের স্বর্গটি নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। বাইরের স্বর্গের জন্য তাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয় না।

তিনি লক্ষ্য করেছেন :

> বিকাশকে বড় করে দেখে না বলে ধর্ম সাধারণত ইন্দ্রিয় সাধনার পরিপন্থী। অথচ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবন সাধনারই অপর নাম কালচার। মন ও আত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত করে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বকের নবজন্মদানই কাল-চারের উদ্দেশ্য।

তাঁর উপলব্ধি অনুযায়ী

> সংস্কৃতি মানে values সম্বন্ধে ধারণা। ধর্মের মতো মতবাদ বা আদর্শও তা ধ্বংস করে দিতে পারে। ধর্মের সমস্ত দোষ মতবাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। মতবাদী ধার্মিকের মতোই অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ, ধার্মিকের মতোই দলবদ্ধতায় বিশ্বাসী, অধিকন্তু ধার্মিকের চেয়েও নিষ্ঠুর। .. আইডিয়ার গোড়ামি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজের বা নিজের দলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে একটু-খানি সন্দেহ রাখা। এই সন্দেহটুকুই মানুষকে সুন্দর করে তোলে, আর সৌন্দর্যই সংস্কৃতির লক্ষ্য।

এখানে values বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন বাঙলা ভাষায় তাকে বলা হয় মূল্যবোধ। মূল্যবোধ বা মূল্যের বোধ হলো — কোন্ জিনিস মূল্যবান কোন্ জিনিস কম মূল্যবান ও কোন্ জিনিস মূল্যহীন ক্ষতিকর—সে সম্পর্কিত বোধ বা চেতনা। বলা যায়, সৌন্দর্যবোধ ও বিচার

ক্ষমতারই অপর নাম মূল্যবোধ। ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি নির্ণয়ের ইচ্ছা দ্বারা আমাদের মনের যে অবস্থাকে বোঝানো হয়, তাকেই বলা হয় মূল্যবোধ। মূল্যবোধ সম্পর্কে মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখেছেন ঃ

> নিকটবর্তী স্থূল সুখের চেয়ে দূরবর্তী সূক্ষ্ম সুখকে, আরামের চেয়ে সৌন্দর্যকে, লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে আনন্দপ্রদ সুকুমার বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষা ও ক্ষতি স্বীকার করতে শেখা — এ সবই মূল্যবোধের লক্ষণ, আর এ-সকলের অভাবই মূল্যবোধের অভাব।

সংস্কৃতিকে তিনি অনুভব করেছেন জীবন যাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় রূপে। তাঁর ভাষায় ;

> সংক্ষেপে, সুন্দর করে, কবিতার মতো করে বলতে গেলে সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা ; প্রকৃতি সংসার ও মানব সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা ; আকাশের নীলিমায়, তৃণগুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা ; বিরহীর নয়নজলে, মহতের জীবনদানে বাঁচা ; গল্পকাহিনীর মারফতে নরনারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা ; ভ্রমণ কাহিনীর মারফতে বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা ; ইতিহাসের মারফতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা ; জীবনকাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখনিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।

এখানে যেভাবে বাঁচার কথা বলা হয়েছে সেইভাবে বাঁচার জন্য মানুষকে সব সময় সক্রিয় থাকতে হয় ; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত — বহুবিধ কর্মে নিয়োজিত থাকতে হয়। জীবনকে সংগ্রাম ও সাধনা রূপে গ্রহণ করতে হয়। কোনো কর্তব্যকে অবহেলা করলে, কিংবা একরোখা-একচোখা একগুঁয়ে হলে সুন্দর-মহৎ--প্রবল-প্রচুরভাবে জীবনযাপন করা যায় না।

বঙ্কিমের কালে কোনো বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশের সময় বক্তব্য বিষয়ের সর্বাঙ্গীনতার প্রতি আর পরিবেষ্টনের সঙ্গে তার সংযোগ সম্পর্কে লেখকগণ যে সতর্কতার পরিচয় দিতেন, একালের লেখকদের

মধ্যে তা সুলভ নয়। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর চিন্তাধারায়ও অভাব আছে এই সর্বাঙ্গীণতার। তবু তাঁর চিন্তার মূল্য সামান্য নয়, আমাদের দেশের এ কালের মহৎপ্রাণ চিন্তাবিদদের একজন তিনি।

গত অর্ধ শতাব্দী কালের বাঙলা ভাষার লেখকদের প্রায় সকলেই সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু না কিছু লিখেছেন। বহু গ্রন্থের নামে, প্রবন্ধ ও সম্পর্কের নামে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে অধিকাংশ লেখকই 'সংস্কৃতি কি'—এ প্রশ্নটি নিয়ে বিশেষ ভাবনা-চিন্তা করেন নি। ফলে সংস্কৃতি বলতে তাঁরা কি বোঝেন — তাঁদের লেখা থেকে তা সহজে উদ্ধার করা যায় না। তা ছাড়া সংস্কৃতির ধারণাটি ব্যাখ্যা না করেই অনেকে সংস্কৃতি শব্দটির সঙ্গে নানা বিশেষণ অথবা সম্বন্ধ পদ যোগ করে, কিংবা সংস্কৃতি শব্দটিকেই বিশেষণে রূপান্তরিত করে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁদের কারও কারও হয়তো পরিচ্ছন্ন ধারণা আছে—কিন্তু সেটি হয়তো বিশেষত্বহীন, কিংবা দুর্বোধ্য। তা ছাড়া অনেকের রচনাতেই আছে কেবল চর্বিতের চর্বন। বর্তমান সম্পর্কে সেগুলোর উল্লেখ আমরা করতে চাইনা।

সাম্প্রতিক কালের লেখকদের মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ে আহমদ শরীফের চিন্তার বিশেষত্ব আছে এবং সমাজে তার প্রভাব আছে। তাই তাঁর মত এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর মতামতের প্রতি-নিধিত্ব আছে নিম্নোক্ত বক্তব্যে ঃ

> সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলা একটু কঠিন। কঠিন এই কারণে যে, সংস্কৃতিকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কঠিন তরল বা বায়বীয় কোন পদার্থের মতো সংস্কৃতিকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে পাওয়া যায় না। তবু সংস্কৃতি বলে একটা কিছু যে আছে, তা চেতনা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করেন এবং অনুভব করেন। সংস্কৃতি বিমূর্ত বিষয়—উপলব্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। সংস্কৃতির কোন বস্তুগত অস্তিত্ব না থাকার ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা অনেকটা অন্ধের 'হস্তীদর্শন ন্যায়' এর মত ব্যাপার। সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা যতই আলোচনা করি, যতই মত বিনিময় করি, মনে হয়, কোন দুইজন ব্যক্তির ধারণাই এ সম্পর্কে হুবহু এক হবে না।…

সংস্কৃতিকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কোন বস্তুর মত মূর্তিমান দেখা যায় না, তবু মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবহারিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ইত্যাদি সকল কর্ম-কাণ্ডের মধ্যেই—তার সংস্কৃতি নিহিত থাকে। সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা—মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টা দ্বারা যে সৌন্দর্য্যচেতনা, কল্যাণবুদ্ধি ও শোভন জগৎদৃষ্টি অর্জন করতে চায়—তাকেই হয়.তা তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা—মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টা দ্বারা যে সৌন্দর্য চেতনা, কল্যাণ-বুদ্ধি ও শোভন জগৎদৃষ্টি অর্জন করতে চায়—তাকেই হয়তো তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিস্রুত জীবন চেতনা। জীবিকা সম্পৃক্ত ও পরিবেষ্টণী প্রসূত হলেও প্রজ্ঞা ও বোধি সম্পন্ন ব্যক্তিচিত্তেই এর উদ্ভব এবং বিকাশ, ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজে এবং সমাজ থেকে বিশ্বে হয় তা ব্যাপ্ত। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর, শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদারতা, কল্যাণ বুদ্ধি ও মহত্ত্বই সংস্কৃতিবানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অনুকৃত অনুশীলিত হয়ে সংস্কৃতিবানের কাছ থেকে সংস্কৃতি সমাজে, দেশে সংক্রমিত হয়, এবং অথবা তা পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে। বাঙালী-সংস্কৃতি, হিন্দু-সংস্কৃতি, বৌদ্ধ-সংস্কৃতি, মুসলিম-সংস্কৃতি, ইউরোপীয়-সংস্কৃতি, মধ্যযুগের সংস্কৃতি ইত্যাদি কথার তাৎপর্য এভাবেই বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। যে কোন উদ্ভাবন আবিষ্কার ব্যক্তিগত চিন্তা অনুভূতি ও প্রয়াসের ফল। সংস্কৃতির সঙ্গে এই উদ্ভাবন শক্তির সম্পর্ক আছে। সাধারণ মানুষ সৃষ্টিশীল নয়, তাদের উদ্ভাবন ক্ষমতা বা নতুন ভাবে চিন্তা করার শক্তি নেই। এ জন্য তারা গ্রহণশীল হয়েই সংস্কৃতিক্ষম হয়। কাজেই সৃজনশীলতার সঙ্গে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই। নইলে সংস্কৃতির ধারা সচল থাকেনা।[১৫]

সংস্কৃতি বিষয়ে মার্কসবাদীদের এবং মার্ক্সবাদ-সমর্থকদের চিন্তাধারায়

স্বাতন্ত্র আছে। তবে এক্ষেত্রে অধিকাংশের চিন্তাই স্থূল, গতানুগতিক, সৃষ্টি সম্ভাবনাহীন। তবে কারও কারও চিন্তা এসব সীমাবদ্ধতা থেকে কম বেশী মুক্ত। মার্কসবাদীরা বিশেষ করে 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন' কথাটি ব্যবহার করেন এবং রাজনৈতিক সংগঠনের সমান্তরালে রাজনীতির অধীন সাংস্কৃতিক সংগঠন পরিচালনা করে থাকেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলন' বলতে তাঁরা সাধারণত বুঝিয়ে থাকেন প্রগতির লক্ষ্যে কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রস্তুতির স্তর হিসেবে জনগণের চিন্তা ধারা পরিবর্তনের আন্দোলন, জনগণকে সচেতন করে তোলার ও সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার আন্দোলন। তবে বাস্তবে দেখা যায় বাঙলা ভাষী সমাজে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মার্কবাদীদের রাজনৈতিক সংগঠন আর সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন একাকার হয়ে যায়। তাতে চিন্তায় ও কর্মে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি দেখা দেয়। মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে গোপাল হালদার ও বদরুদ্দীন উমরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে।

'সংস্কৃতির রূপান্তর' বইতে গোপাল হালদার লিখেছেন ঃ

> সংস্কৃতির অর্থ কী, এই প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে জাগা উচিত — মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই। তাহার অর্থ — মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই তাহার সংস্কৃতি ; এই 'কৃতি'র বা কাজের বলেই মানুষ মানুষ হইয়াছে, প্রকৃতির নিয়মও বুঝিয়া উঠিতেছে, বাধা ছাড়াইয়া যাইতেছে।
>
> প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা বাঁচিয়া থাকা। মানুষ এই তাড়নায় চাহে আপনার পরিবেশের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া টিকিয়া থাকিতে। অর্থাৎ মানুষ চায়, বাঁচিবার উপায় যতটা পারে প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইহারই নাম জীবিকা-চেষ্টা। মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া, অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত করা, তাহা সহজসাধ্য করা।... সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি ; আর সংস্কৃতির মোট অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে মানবপ্রকৃতির এই স্বরাজ-সাধনা।[১৬]

গোপাল হালাদারের রচনাবলীতে মানুষের চিন্তাশক্তির ও শ্রমশক্তির

কিছু বৈশিষ্ট্য, মানুষের সৃজন সামর্থ, প্রকৃতিকে জয় করে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাবার শক্তি — মানুষের ইতিহাস সৃষ্টি করার শক্তিই অভিহিত হয়েছে সংস্কৃতি বলে। এই চিন্তাধারায় এসেছে মানুষের শ্রেণীগত অবস্থান ও তার সংস্কৃতির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের কথা। সংস্কৃতির রূপান্তর গ্রন্থে গোপাল হালদার আসলে সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসই বর্ণনা করতে চেয়েছেন।

বদরুদ্দীন উমর বিগত চার দশক কালের মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে তিনি কি বোঝেন, সে কথা কোথাও যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলেন নি। 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ[১৭]

সংস্কৃতি কি ? এ নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক সম্ভব হলেও এর স্বরূপ উপলব্ধির সহজ উপায়, সংস্কৃতির অভিব্যক্তি বলতে আমরা যা-কিছু বুঝি সেগুলোর প্রতি লক্ষ্যপাত করা। যেমন আচার—ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত-নৃত্য সাহিত্য-নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি। এগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথমতঃ এগুলি নিত্যকার জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়তঃ জীবন উপভোগের ব্যবস্থা এবং উপকরণের সাথে জড়িত। কোন জাতির অথবা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলতে এ জন্যে তার সামগ্রিক আর্থিক জীবন থেকে শুরু করে ললিতকলা এবং শিক্ষাচার পর্যন্ত সবকিছুই বোঝায়। অর্থাৎ সেই দেশ ও জাতির অন্তর্গত মানুষদের জীবনযাপন এবং জীবনোপভোগের যাবতীয় পদ্ধতি এবং আয়োজনই এর অন্তর্গত। কোন লোকের সংস্কৃতি কি —এ কথা বোঝার জন্য প্রয়োজন তার আর্থিক জীবন, ভাষা, শিক্ষা, রুচি, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবকিছুর সাথে ওয়াকিফহাল হওয়া।

সাধারণত দেখা যায় একই দেশ, জাতি অথবা ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত হলেও মানুষে মানুষে রুচির অনেক প্রভেদ থাকে। এই পার্থক্যের কারণ সন্ধান করলে মোটামুটিভাবে দেখা যাবে যে, এই সমস্ত লোকের জীবন যে প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেগুলি এক নয়। এজন্যই দেখা যায় যে ইংরেজী, ফরাসি, রুশীয়, চৈনিক, বাঙালী, পাঞ্জাবী, যে সংস্কৃতিই হোক-না-কেন, তাদের প্রত্যেকটির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকলেও এক একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক গণ্ডীর মধ্যে

আবার অনেক ছোট গণ্ডী থাকে।

তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ঃ

> সংস্কৃতির সর্বাপক্ষা উল্লেখযোগ্য উপাদান হল আর্থিক জীবন, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং বর্ণ। এগুলির প্রত্যেকটির ভিত্তিতেই মানবসভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে তত্ত্বগতভাবে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। শুধু ভাষার ভিত্তিতে সংস্কৃতিকে ল্যাটিন, আরবী, ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান, পাঠান, পাঞ্জাবী, বাঙালী ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া সম্ভব। আর্থিক জীবনের ভিত্তিতে সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, মধ্যবিত্ত, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি বলা যায়। ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে সংস্কৃতিকে ভারতীয়, ইউরোপীয়, আমেরিকান, এশীয়, মধ্যপ্রাচ্যীয় ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। আবার ধর্ম অথবা জীবনাদর্শের ভিত্তিতে তাকে খৃস্টীয়, ইসলামী, বৌদ্ধ, হিন্দু, কমিউনিস্ট, ইত্যাদি নামে অভিহিত করা চলে। কিন্তু সংস্কৃতিকে এইভাবে বিভিন্ন ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে তত্ত্বগতভাবে একটি নাম দিলেই সেগুলি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। এই বিভাগগুলির মধ্যে গুরুত্বের প্রভেদ থাকে, এবং সংস্কৃতির আলোচনাকালে সে প্রভেদকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

তিনি লক্ষ্য করেছেন ঃ

> সংস্কৃতির চরিত্র বিচারে কোন উপাদানের গুরুত্ব কত বেশী সেটা নির্ভর করে উপাদানগুলির কোনটির প্রভাব জীবনের তুলনায় কত কমবেশী তার উপর। সে দিক থেকে বিচার করলে আর্থিক জীবন এবং ভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক। এই একই কারণে ধর্ম সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেটা নির্ভর করবে সাধারণ জীবনযাত্রার উপর ধর্ম কতখানি প্রভাবশীল তার উপর। এ জন্যে দেখা যায় যে মধ্যযুগীয় ইউরোপে সংস্কৃতির উপর ধর্মের যে প্রভাব ছিল বর্তমান ইউরোপে সে প্রভাব নেই। তেমনি বর্তমান কালে অনুন্নত দেশ-গুলিতে ধর্মের যে প্রভাব লক্ষিত হয় সেটা উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় না। এর কারণ সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ধর্মের স্থান যত উঁচুতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তত উঁচুতে নয়। আবার সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাবের চিহ্ন বিশেষ

আর থাকে না। এর ফলে সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ে মানুষ ধর্ম নিয়ে যত মাতামাতি করে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেটা আর করে না। শিক্ষা-দিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে ধর্মের প্রভাব কমে আসে এবং তার ফলে সাধারণভাবে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সে প্রভাবও আর পূর্বের মতো চিহ্নিত হয় না। - সামাজিক উন্নতি যত নিম্ন পর্যায়ের থাকে ধর্মের প্রভাব সমাজের মধ্যে তত বেশী হয়, এবং সংস্কৃতি তার দ্বারা হয় অনুরূপভাবে গঠিত। কাজেই সাধারণ জীবনযাত্রায় ধর্মের প্রভাব যত কমে আসে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ধর্ম হয়ে পড়ে ততই গুরুত্বহীন। সে সময় ধর্মের স্থান অধিকার করে কোন বিশেষ জীবন দর্শন, অথবা কোন নতুন প্রত্যয়।

এখানে বদরুদ্দীন উমরের যে মতামত আমরা উদ্ধৃত করলাম সেগুলো তাঁর 'সাংস্কৃতিক সামপ্রদায়িকতা' বই থেকে। এ বই প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সনে। তখনও তিনি নিজেকে মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেন নি। মার্কসবাদী বলে আত্মপরিচয় দিয়ে যখন থেকে তিনি লিখছেন, তখন থেকে যে কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণে তিনি; বহুলাংশে এদেশের অপরাপর মার্কসবাদীদের মতই, শ্রেণী, শ্রেণীবৈষম্য, শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণীচরিত্র ইত্যাদি কথার সাহায্যে নিজের ধারণাকে ব্যক্ত করে থাকেন। লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, বাদরুদ্দীন উমর সহ এদেশের সব মার্কসবাদীই মানবিক ও সামাজিক ব্যাপার বিশ্লেষণের সময় মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সমূহ কখনও সদর্থে বিবেচনায় আনেন না, সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায়ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে অবহেলা করে যান।

অপরদিকে ধর্মপন্থীরা সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনায় সাধারণত বিশ্বাসের বদ্ধতায়, ধর্মীয় বিধি-বিধানের রীতি-নীতির ও আচার আচরণের প্রশ্নে এবং সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ও বুদ্ধির মুক্তির অনুসারীরা সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় গুরুত্ব দেন মানুষের সত্তার স্বাতন্ত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নে নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধের প্রশ্নে, বিবেক ও যুক্তির প্রশ্নে প্রকৃতিকে আয়ত্ত করে টেকনোলোজির বিকাশ সাধনের ও মানবীয় সুখ-সমৃদ্ধি

বর্ধনের প্রশ্নে, মানুষের মনোজীবনকে শিক্ষিত, পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত করার প্রশ্নে, প্রতি কর্মে এবং প্রতি চিন্তায় সৌন্দর্যবোধ, প্রেম ও কল্যাণবোধ ফুটিয়ে তোলার সজ্ঞান, সচেতন, সশ্রম, পারম্পর্যশীল ধারাবাহিক প্রয়াসের প্রশ্নে।

বাঙলা ভাষায় যাঁরা সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন তাঁদের কেউ কেউ সংস্কৃতির ধারণার সঙ্গে সভ্যতার ধারণার স্বরূপ বিচার করতে চেয়েছেন। কেউ কেউ দুয়ের পার্থক্যের প্রশ্নে গুরুত্ব কম দিয়ে দুটি ব্যাপারকেই মর্মগত দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন বলে গণ্য করেছেন; কেউ কেউ আবার নানা সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সংস্কৃতির অভিব্যক্তি মননগত সৃষ্টির—শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যেমন ঘটে তেমনি ঘটে মানুষের বস্তুগত সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। প্রথমোক্ত ধারার সৃষ্টিকে তাঁরা বলেছেন মানস-সংস্কৃতি এবং শেষোক্ত ধারার সৃষ্টিকে বলেছেন বস্তুগত সংস্কৃতি। এভাবে যাকে বলা হয়েছে বস্তুগত সংস্কৃতি, তাকেই আবার অনেকে বলেছেন সভ্যতা—কেবল মননগত ব্যাপারকেই তাঁরা বলেছেন সংস্কৃতি।

'অপসংস্কৃতি' 'কুসংস্কৃতি' 'সংস্কৃতির বিকার', 'অসুস্থ সংস্কৃতি' 'সংস্কৃতির অধোগামিতা'—এ ধরনের কিছু কথা, ভাষাগত বিচারে ভুল হোক বা সুদ্ধ হোক, উদ্ভাবিত হয়েছে বিজ্ঞান প্রযুক্তির কিছু নূতন উপহার বাংলাভাষী আমলে প্রথমবারের মত আমদানী হওয়ার ফলে। বাংলাদেশে যেমন তেমনি পশ্চিম বাংলায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে টেলিভিশনের ব্যাপক প্রচার সেই সঙ্গে ভি সি আর ইত্যাদির আমদানী, নানা ধরনের বৃহদায়তন উন্নত ধরনের প্রিন্টিং প্রেসের আমদানী এবং তার সুযোগে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহের আকস্মিক উদ্ভব. সিনেমা হলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও দূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত তার প্রসার, টু-ইন ওয়ান-এর ব্যাপক প্রচলন ইত্যাদি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এই দান সমূহ বাংলা-ভাষী অঞ্চলে যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা মানুষের নৈতিক চেতনায়—মূল্যবোধে—বিরাটভাবে আঘাত করেছে। এ দেশের লোকের মানস প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে অনেকে বিজ্ঞানের এই দান সমূহের প্রতিই বিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন, অনেকে এসবের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল সরকার, সরকারী

সংস্থা, পুঁজিবাদী গোষ্ঠী, নয়া উপনিবেশবাদী আয়োজন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেও বিরোধী রাজনৈতিক মহল থেকে পূর্বোক্ত কথাগুলো উত্থিত হয়েছে। ভাষাগত শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার বাদ দিয়ে কথাগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহারটির অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে কথাগুলোকে অর্থসমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। এই সব কথা দ্বারা যা বোঝানো হয় তা হল, সংস্কৃতি চেতনার, নৈতিক চেতনার, মূল্যবোধের বিকৃতি ও বাস্তব কর্মকাণ্ডে তার প্রকাশ যা মানবীয় পরিবেশকে—সমাজিক পরিবেশকে জাতীয় চরিত্রকে কলুষিত করে—মানুষকে সমাজকে জাতিকে ধ্বংসের পথে—ক্ষয়ের পথে—ক্ষতিকর কাজে—আত্মবিধ্বংসী কর্মে পরিচালিত করে। আকস্মিকভাবে আমদানী করা প্রযুক্তির উপাদান সমূহ যেভাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে সকলকে বিপথগামী আত্মবিধ্বংসী হওয়ার আয়োজন করে দেওয়া হয়েছে—এই রকম ধারনা অনেকের মনে জেগেছে। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এসেছে পূর্বোক্ত কথাগুলো, এবং কথাগুলো বাংলাদেশে এবং পশ্চিম বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে অভিন্ন অর্থে। পশ্চিম বাংলায় উদ্যোগটা এসেছে সরকারী মহল থেকে, বাংলাদেশে সরকার বিরোধী মহল থেকে। 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি গ্রন্থের ভূমিকায় নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন ঃ

> সংস্কৃতি একটি সার্থক, রচনাত্মক, সুস্থ শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা জীবনকে সুন্দর করে, প্রাণবান করে, সার্থক করে। অপসংস্কৃতি ঠিক তার বিপরীত। ...অপসংস্কৃতি কথাটার মধ্যেই যে শুধু নঙর্থক ব্যন্জনা আছে তাই নয়, তার পরিমাণও নঙর্থক। অপসংস্কৃতি জীবনকে অসুন্দর করে, কুরুচিময় করে, তার প্রবৃত্তিকে বিপথগামী করে, তাকে অস্থির ও অশান্ত করে তোলে। তামসিকতায় এর স্থিতি, বিকারে এর পুষ্টি। ...অপসংস্কৃতি বস্তুটি মানবতা-বিরোধী, জন-বিরোধী। যে-শিল্পের চর্চায় ও উপভোগে মানুষের প্রবৃত্তি নিম্নগামী হয় তা কখনই জনকল্যাণ-মূলক হতে পারে না। ...অপসংস্কৃতি মানেই হল সংস্কৃতির অনাচার; আর এই অনাচারের মূলে আছে জনস্বার্থ বিরোধী একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিবান।[৮]

বাংলাদেশে একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার মহলসমূহ থেকে সংস্কৃতির চেতনার বিকৃতির ও নিম্নগামিতার পরিচায়ক নানা ধরনের অশ্লীল ও আত্মবিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ দেখা যাচ্ছে, অপরদিকে দেখা দিচ্ছে ইসলামের নামে নানা প্রকার উৎকট, নৈতিক চেতনার পরিপন্থী ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপ। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মানুষের নৈতিক চেতনায় স্বাভাবিক সুস্থ বিকাশের পথ হয়ে পড়ছে রুদ্ধ।

সব কিছুই স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষয় পায়, লয় পায় — রূপান্তরিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই কোন কোন কাল বিশেষভাবে ক্ষয়ের বা ধ্বংশের কাল রূপে চিহ্নিত হয়। কোন সমাজের বিকাশের যে পর্যায় ইতিহাসে যুগসন্ধি, ক্রান্তিকাল, বা যুগসংক্রান্তি বলে চিহ্নিত হয় তার প্রথম পর্যায়টা বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে ক্ষয়ের, পতনের বা ধ্বংসের কাল বলে। এই পর্যায়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত শক্তি, প্রচলিত আদর্শ দূর্বল ও ধ্বংস হতে থাকে, কার্যকারিতা হারাতে থাকে, আর নূতন কোন শক্তিও গড়ে উঠতে পারে না। নূতন কিছু গড়ে ওঠার পর্যায়েই সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে ভেঙ্গে পড়ে।

বাঙলা ভাষী সমাজ বিগত অর্ধশতাব্দী কাল ধরে — বলা যায় ইংরেজ শাসনামলের শেষ পর্যায় থেকে আজ পর্যন্ত এক যুগসন্ধি বা ক্রান্তিকাল বা যুগসংক্রান্তির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। একালে এই সমাজে ব্রিটিশ শাসনকালের পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে, নূতন কিছুও স্থিতি ও প্রশান্তি পাচ্ছে না। ক্ষয়ের লক্ষণই প্রধান লক্ষণ। নূতন যেসব মূল্যবোধ ও পরিকল্পনা স্থায়িত্ব পাওয়ার কথা, সেগুলোও গড়ে ওঠার কিংবা বিকশিত হওয়ার আগেই ক্ষয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের ক্ষয়ই অভিহিত হচ্ছে অবক্ষয় বলে। মানুষের প্রবৃত্তির অধোগামিতা অবক্ষয়ের সবচেয়ে মৌলিক কারণ সমূহের একটি।

সংস্কৃতি চেতনার সুস্থ বিকাশ এবং সাফল্যসম্ভব নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন অবক্ষয়ের অবসান চিহ্নিত করতে পারে। এজন্যই এখানে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা-সমালোচনা দরকার।

বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছেন "মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য" কিংবা তাঁর ভাষায় যা 'অনুশীলনতত্ত্ব' 'মনুষ্যত্বতত্ত্ব' 'অনুশীলনধর্ম, 'মনুষ্যত্বধর্ম 'সুখ', মোতাহের হোসেন

চৌধুরীর ভাষায় যা "ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবন সাধনা" এবং "চক্ষু, কর্ণ নাসিকা জিহবা, ত্বকের জন্মদান", শরীফের ভাষায় যা "অর্জিত আচরণ পরিস্রূত জীবনচেতনা" "আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা উদারতা, কল্যাণবুদ্ধি ও মহত্ত্ব" আর বদরুদ্দীন উমরের ভাষায় যার পরিচয় পাওয়া যায় মানুষের "আর্থিক জীবন, ভাষা, শিক্ষা, রুচি, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবকিছুর" মধ্যদিয়ে, সংস্কৃতি নামক সেই সত্তাটি বাঙলাদেশের রাজনৈতিক মহলে, বুদ্ধিজীবী সমাজে, শ্রমজীবী সমাজে এবং রেডিও টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ইত্যাদিতে আজ এক বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বেগম রোকেয়া, আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, নজরুল ইসলাম, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, গোপাল হালদার, আবু শরীফ আইয়ুব, নারায়ণ চৌধুরী, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর প্রমুখ স্বাপ্নিকেরা কি বাঙলা ভাষী ভূখণ্ডে এক একটি নির্জন দ্বীপের মতো নিঃসঙ্গ নন। কেউ কেউ জনতার কোলাহলের মধ্যে আছেন — কিন্তু তাঁদের ভাবধারার উপলব্ধি সমাজে নেই, তারা জনতায় নির্জন। রবীন্দ্রনাথের নামে একদল এবং নজরুল ইসলামের নামে আর একদল ভয়ানক রকম পাগল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এবং নজরুলের স্বপ্নকে বোঝবার কোন চেষ্টা কি তাদের আছে? বড় জোর তারা কেবল গান শোনার আর কবিতার আবৃত্তি শোনার অনুরাগী। এর মধ্যে সংস্কৃতি চেতনার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের এবং জীবনের সর্ব মাত্রিক প্রস্ফুটনের সম্ভাবনা কোথায়?

তথ্যপঞ্জী

১. নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.), "অপসংস্কৃতি ও সংস্কৃতি", কলিকাতা (১৩৮৪ ফাল্গুন), ভূমিকা দেখুন।

২. ঐ

৩. ঐ প্রকাশকের নিবেদন দেখুন।

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "সাংস্কৃতিকী", কলিকাতা (১৩৬৮), পৃ. ৮। গ্রন্থে উল্লেখ আছে উক্তিটি 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত' 'সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধের শেষে তারিখ মুদ্রিত আছে 'বঙ্গাব্দ ১৩৫৩'।

৫. উদ্ধৃত: নীহাররঞ্জন রায়, "কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি", কলিকাতা (১৯৭৯

পৃ. ৫। "প্রবাসী" পত্রিকা (আশ্বিন ১৩৪২) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

৬. নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ১।

৭. নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ১।

৮. নীহাররঞ্জন রায়, ঐ পৃ. ৬।

৯. "পরিচয়"-পত্রিকা, মাঘ ১৩৩৯।

১০. নীহাররঞ্জন রায় পূর্বোক্ত, পৃ. ৬-৭।

১১. ঐ পৃ. ৭।

১২. ঐ, পৃ ১২।

১৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

১৪. এ-প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সবগুলো উদ্ধৃতিই তাঁর 'সংস্কৃতি-কথা", ঢাকা (১৩৬৫) গ্রন্থের 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধের অন্তর্গত।

১৫. বদরুদ্দীন উমরের উদ্ধৃতি সমূহ তাঁর "সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়িকতা", ঢাকা (১৯৬৮) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

১৬. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, ঢাকা (১৯৭৪), পৃ. ৩১।

১৭. নারায়ণ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।